আজকের কাগজ 06

তারিখ 08 SEP 1993
পৃঃ ৪ কলাম ২

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯৩

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শিক্ষার পরিবেশকে গ্রাস করতে চাইছে এক বিষবাষ্প। একে বাধা দিতে হবে, অন্যথায় একটি জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে টিকে থাকা দায় হবে। দুঃখজনক হলেও মনে হচ্ছে, শিক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির গলদ, শিক্ষার মান ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনার যেনো কোন অবকাশ করে উঠতে পারছি না। এক্ষেত্রে মূল্যবোধহীনতার কথা নিয়ে আমরা যে চায়ের কাপে ঝড় তুলি না তা নয়। কিন্তু নীতি ও মূল্যবোধের বীজ রাতারাতি মানুষের মনে গেঁথে দেয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সার্বিক সামাজিক পরিবেশের কথা এসে যায়। কয়েকশ' বছরের ঔপনিবেশিকতার অভিশাপে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম, নীতিহীনতা ও বিশৃংখলার চাপে রুগ্ন, ক্ষুধার্ত সমাজ প্রতিবেশে সৎ মূল্যবোধ ক্রমাগত পরাজয় বরন করছে। তাই শিক্ষা সিস্টেম বা পদ্ধতির কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় আজকের এ পবিত্র দিনে বছরের পর বছর আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছি। ফলে, এক্ষেত্রে সিস্টেম লস হচ্ছে শতকরা অন্তত তিন চতুর্থাংশ। একমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই পাঁচ বছর মেয়াদী (৬–১০ বছর বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে) শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার এখনও শতকরা ৬৫ ভাগ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সের ক্ষেত্রে ঝরে পড়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইত্যাদি মিলিয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি ও সমাপ্তের হার অত্যন্ত নগণ্য। তাই, শিক্ষার্থীরা যেনো নকলে উৎসাহিত না হয় কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম পড়ে সংক্ষিপ্ত সাজেশন মুখস্ত করে পরীক্ষায় স্টার নম্বর পাবার চিন্তা না করে এ ধরনের একটি সুস্থ শিক্ষা কাঠামো চালু করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিক্ষা কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতির সুষ্ঠু পরিবর্তন এ মুহূর্তে একটি যুদ্ধ ঘোষণার মতই জরুরী। অন্যান্য বছরের মত এবারও ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস অনেক আশা নিয়ে আসছে। বিগত দিনগুলোর কথা মনে রেখে এবার আমরা সত্যিকার বাস্তবায়নযোগ্য কিছু কর্মসূচী যেন গ্রহণ করতে পারি সে কামনা করে কিছু আলোচনা ও কিছু সুপারিশ রাখার প্রয়াস নিচ্ছি। আশির দশকের শেষ ও নব্বই-এর প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন থাইল্যান্ডের জমতিয়ানে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব শিক্ষা কনফারেন্সে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাছাড়া সাধারন শিক্ষা প্রকল্প নামে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ (আনুমানিক ১১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ)টি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি আলোচনায় পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে সহায়তা করেছিলাম। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য বা কোন সমস্যা নজরে এলে স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এসে যায়। যাক সেসব কথা। নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি মূল সমস্যা। এ সমস্যা নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চরিত্র। সচ্ছল শ্রেণীর জন্য প্রণীত (বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক) শিক্ষা ব্যবস্থা একান্তভাবেই শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী আজ নিরক্ষরতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ। দেশের শতকরা প্রায় সত্তর শতাংশ নিরক্ষর জনগণের অধিকাংশই গ্রামবাসী। তারা শিক্ষার দাবি নিয়ে খাদ্যের দাবি নিয়ে বাসস্থানের দাবি নিয়ে জন্মেছে অথচ তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অসহনীয় জীবন যাপন করছে। একদিকে জনসংখ্যার চাপ (Population) পরিবেশ দূষণ (Pollution) ও দরিদ্র (Poverty) অর্থাৎ ইংরেজী বর্ণমালার ৩টি 'P' ও অন্যদিকে জ্বালানির (Energy) সমস্যা, পরিবেশ (Environment) সংকট ও শিক্ষার অনগ্রসরতা (Education) তথা ইংরেজী বর্ণমালার ৩টি 'E' তে মিলে এমন এক সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে ১৯৭২-৯২ সন অর্থাৎ ২০ বছরে বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে মাত্র শতকরা ৩.৮ ভাগ। ১৯৯৩ সনে অন্ততঃ দু'ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। বিদেশী সংবাদ মাধ্যম (উদাহরণস্বরূপ এশিয়া উইক সেপ্টেম্বর '৯৩) বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৩৫.৫ উল্লেখ করলেও সরকারী হিসাব মোতাবেক এটা ৩১ বা ৩২ শতাংশ বলা হয়ে থাকে। কি কারণ বা সঠিক তথ্যই বা কি তা জানার অধিকার জনগণের নিশ্চয় রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিরক্ষর জাতি কোন দিনই নিজের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয় না। তাই নিরক্ষরতার সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক নিকটতম। শুধু তাই নয় দারিদ্র্যের কারণেই বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরিবেশ দূষণ করে অনেকটা নিজেদের অজান্তেই। যথাযথ জ্ঞানের বা জ্ঞান প্রয়োগের অভাবে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়। নিরক্ষর গোষ্ঠীই অধিকতর স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টির অভাব ও পরিবেশ দূষণের শিকার হয়। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে নিম্নমানে বসবাস করে। অথচ গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের ওপর নির্ভর করছে দেশের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত। নিরক্ষরতার চাপে উন্নয়নের চাবিকাঠিতে ময়লা জমছে। ফলে এদেশের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা গড়ে উঠছে না, আর সেজন্যই শিক্ষাও দূরে সরে যাচ্ছে। তাই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে তাদের জন্য ন্যূনতম পক্ষে সাক্ষরতা অর্জন অত্যাবশ্যক। এ সাক্ষরতা বয়স্কদের জন্য আরও অতীব প্রয়োজনীয়। অন্যথায় তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হকদার হয়েও শরীক হতে পারছেন না। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না করতে পারলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত (১৫-৩৫ বছরের) উৎপাদনক্ষম মানুষগুলো সভ্যতা ও আধুনিকতার জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবেন।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা এদেশের মানুষ অনেকদিন থেকেই অবহিত। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে নানাভাবে টানাহেচড়া চলেছে। এক সময়ে কলমের খোঁচায় ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ হয়েছে। এ সরকারীকরণের ফলেই অন্তত আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে আসছে। যতই এসএমসি বা পিটিএ ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতন জনগণকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, তাদের যথাযথ ক্ষমতায়ন না করলে এবং এলাকাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়ে না তুললে অবস্থার উন্নতি হবে না। কাজেই এ সমুদয় বিষয় আরোও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা – এসব কিছুই চলছে ঢাকা কেন্দ্রিক এবং মহাপরিচালক এর দপ্তর ভিত্তিক। এ দপ্তরগুলো পরিচালনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক বা মাঠকর্মী নন, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকও নন। কলেজের বা সে পর্যায়ের কর্মকর্তা দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আনুমানিক ৪৬,০০০। এছাড়াও দেশব্যাপী প্রায় ১৫,০০০ এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও সচ্ছল জনগণের জন্য কিন্ডারগার্টেন বেসরকারী স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত কয়েক বছরে স্ফীত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে তাদের জন্য ন্যূনতম পক্ষে সাক্ষরতা অর্জন অত্যাবশ্যক। এ সাক্ষরতা বয়স্কদের জন্য আরও অতীব প্রয়োজনীয়। অন্যথায় তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হকদার হয়েও শরীক হতে পারছেন না। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না করতে পারলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত (১৫–৩৫ বছরের) উৎপাদনক্ষম মানুষগুলো সভ্যতা ও আধুনিকতার জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবেন।